দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUL 5 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিশুদের ওপর পড়াশোনার চাপ

■ মাহমুদা কণা ■

বর্তমানে সর্বত্রই প্রতিযোগিতার ঝক্কি। এর থেকে কারোরই কোন পরিত্রাণ নেই। বিশেষ করে শিশুদের জীবন এই দুঃসহনীয় প্রতিযোগিতার দৌড়ে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে।

প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের মা চান তার শিশুটি সবকিছুতে প্রথম হবে। 'এই সবকিছুতে প্রথম হওয়ার' মানসিকতায় প্রতিটি অভিভাবক আদা জল খেয়ে লেগে পড়েন তার শিশুটির পেছনে। সকাল সাতটায় শিশুটিকে নাকে মুখে নাস্তা করিয়ে স্কুলে পৌঁছে দেন অভিভাবক। বেশীর ভাগ শিশুর দুপুর একটায় ছুটি হয়। রাস্তার যানজট, অসহনীয় গরম, নানান হৈ চৈ হট্টগোল শেষে শিশুটি বাসায় ফিরে। এসেই গোসল করিয়ে হোমটাস্ক নিয়ে বসানো হয় তাকে। এখুনি হোমটাস্ক না করলে পরে সময় পাওয়া যাবে না। কারণ সপ্তাহে দুইদিন গান শিখতে যেতে হয়, অথবা ছবি আঁকতে যেতে হয়। বাসায় আসেন আরবীর শিক্ষক। আর নিত্যদিন তো টিউটর আসেনই। ক্লান্ত শ্রান্ত শিশুটির মনোজগৎ কিভাবে এতকিছু সামলাবে, তা কি আমরা একটুর জন্যও ভেবে দেখি?

এটা তো প্রায় অনস্বীকার্য যে, দু'তিন দশক সময় আগেও পড়াশোনার যে পদ্ধতি ছিল বর্তমান সময়কার পড়াশোনার সাথে তার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এতটা প্রতিযোগিতা তখন ছিল না। বর্তমানে পড়ালেখার যেন শেষ নেই। প্রত্যেকটি শিশু পড়াশোনার চাপে হয়ে পড়ছে রোবট বিশেষ। বুঝুক বা না বুঝুক মুখস্ত করিয়ে নেয়া হচ্ছে। অথচ আমরা একটুও বাচ্চাদের মনের দিকে তাকাই না। এখনকার পরিবেশ পরিস্থিতিতে কারোর মনের দিকে তাকানোরও যেন সময় নেই। শিশু শ্রেণী থেকেই ফার্ষ্ট পেপার, সেকেন্ড পেপার। এই ফার্ষ্ট পেপার সেকেন্ড পেপারের কি মর্ম, তা অনুধাবন করার বয়স, মন, নাই বা থাকলেও তাতে কি! চাপিয়ে তো দেয়া হল। প্রায় প্রত্যেক অভিভাবক শিশু শ্রেণী থেকেই শিশুকে 'দারুণ রেজাল্ট করতে হবে', এই মানসিকতায় শিশুকে লাগামহীন শাসনে জর্জরিত করেন। এক মহিলাকে দেখেছি তার শিশুটি শ্রেণীতে প্রথম হতে পারলো না বলে, ক্ষোভে দুঃখে অন্য এক অভিভাবকের সাথে স্কুল ক্যাম্পাসেই ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যেতে। তাদের বাক্যবাণ ও কুরুচীপূর্ণ ঝগড়া দুই প্রান্ত থেকেই শিশুরা উৎকীর্ণ হয়ে শুনতে ব্যস্ত।

শিশুরা তাদের মায়েদের কাছ থেকে কি শিখছে? কি শিক্ষা গ্রহণ করছে? দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড় য়া এক ছাত্রীর মা এসে অভিযোগ জানালেন, তার মেয়ের নোট খাতা চুরি গেছে। মেয়েটি বরাবর শ্রেণীতে ফার্ষ্ট হয়। এই খাতা নিয়ে উক্ত অভিভাবক স্কুলে এক ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্ম দেন। সরাসরি একজনকে অভিযুক্ত করেন। ঐ অভিভাবকের শিশুটি নাকি অবিকল তার চুরি হয়ে যাওয়া খাতার লেখা লিখেছে। তা আবার জানিয়েছে অভিযুক্ত অভিভাবকের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড় য়া শিশুটি। এই যদি হয় প্রতিযোগিতার নেপথ্য চিত্র, তাহলে একটি শিশুর মানসিক বিকাশে কিভাবে সুস্থতার বীজ নিহিত হবে? কিভাবে পারস্পরিক সম্মান ও মমতার সৃষ্টি হবে? শিশুরা নিজের মনের আনন্দেও কারোর সাথে মিশতে পারে না। শিশু কার সাথে মিশবে এটাও নির্ধারণ করে দেন শিশুর মা বা শিশুর অভিভাবক। শিশু ছোট বেলা থেকেই 'ও পড়াশোনায় ভাল না, ও মন্দ' এই বোধ ও বিশ্বাসের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে। এবং এই বিশ্বাসটি শিশু মনে জাগিয়ে তুলছেন তারই অভিভাবক।

দেখা যায় প্রায় প্রতিটি অভিভাবক শিশুর পাঠ্য বই রেখে উপরের শ্রেণীতে পাঠ্য বই থেকে নোট করে দিচ্ছেন শিশুকে। কারণ আর কিছুই না। বেশী নম্বর পাওয়ার আশা। আর শিক্ষকরাও উদার হয়ে নম্বর বসান, লেখাটি ভাল বলে। এই যদি হয় ভাল নম্বর পাওয়ার ঘটনা, তাহলে পাঠ্য বইগুলি দেয়ার কি দরকার? আর এই প্রথম হওয়ার দৌড়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে শিশুটি হয়ে পড়ছে বিকারগ্রস্ত। অথচ এইদিকে কারোরই তেমন কোন খেয়াল নেই। 'ও পারে, ও প্রথম হয়, তুমি পারবে না কেন?' এই ধরনের বাক্যবাণে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয় শিশুরা।

শিশুকে শিশুর মতই বাড়তে দিতে হবে! শিশুর উপর যদি এত পড়াশোনার চাপ দেয়া হয়, তাহলে কি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে অনাবিল আলোকমালায় জ্বলে উঠতে পারবে? নাকি জ্বলে ওঠা কখনো সম্ভব? ❑